গোলাকার হ্রদ...

রঙবেরঙ ডেস্ক

নানা আকার ও আকৃতির হ্রদের দেখা মেলে পৃথিবীতে। তাই গোলাকার হ্রদের কথা শুনলে আকাশ থেকে পড়বেন এটা আশা করাটা বাড়াবাড়ি। স্বাভাবিকভাবেই আপনি ধরে নেবেন এ রকম গোলাকার হ্রদগুলো মানুষের তৈরি। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কিংসলের কথা যদি বলেন, এটা প্রাকৃতিক একটি গোলাকার হ্রদ।

ওপর থেকে দেখতে রূপার ডলারের মতো মনে হওয়ায় সিলভার ডলার লেক নামে একে চেনেন উড়োজাহাজের পাইলটেরা। বিশেষ করে গ্রীষ্মে পর্যটকদের ও আশপাশের এলাকার মানুষের প্রিয় গন্তব্যে পরিণত হয় এটি। এর পাশাপাশি মাছ শিকারিদেরও জায়গাটি ভারি পছন্দ। তবে একে মানুষের কাছে পরিচিত করে তুলেছে অস্বাভাবিক গোলাকার আকৃতিই।

তবে হ্রদটির এই গোল আকার পরিষ্কারভাবে ঠাহর করতে হলে আপনাকে একে দেখতে হবে উপর থেকে। আর আকাশ দিয়ে উড়োজাহাজ নিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় পাইলটদেরই এই আকারটি নজর কাড়ে বেশি। তারা তাই একে আদর করে ডাকতে শুরু করেন সিলভার ডলার লেক নামে।

কিন্তু মানুষের তৈরি না হলে এটা এমন আকৃতি পেল কীভাবে? ধারণা করা হয়, একটি সিংক হোল হিসেবে হ্রদটির জন্ম। কোনো একটি স্থানের মাটি হঠাৎ অথবা ধাপে ধাপে ধসে গিয়ে জন্ম হয় এই সিংক হোলের। হ্রদটির মাঝখানে সিংক হোল বা গর্তটির অবস্থান।

উত্তর মধ্য ফ্লোরিডার শহর স্টার্ক থেকে ছয় মাইল উত্তরে হ্রদটির অবস্থান। এক পাশ থেকে আরেক পাশ পর্যন্ত এটি দুই মাইল। মোটের ওপর এর আয়তন ২০০০ একরের মতো। কিংসলে হ্রদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্য এলাকার হ্রদগুলোর তুলনায় বেশ অগভীর হলেও ফ্লোরিডার বিবেচনায় হিসাবটা আলাদা। মাঝখানে প্রায় ৯০ ফুট গভীরতা একে ফ্লোরিডার অন্যতম গভীর হ্রদে পরিণত করেছে।

এবার বরং হ্রদটির নাম কিংসলে হলো কেন তা একটু জানার চেষ্টা করি। বিখ্যাত আলাচুয়া ট্রেইলের এক মাইল পূর্বে হ্রদটির অবস্থান। ১৮৩০-৪০ সালের দিকে রেড ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে বেশ কিছু সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এই আলাচুয়া ট্রেইলে। কিংবদন্তি অনুসারে হ্রদের দক্ষিণে তরুণ ক্যাভালারি অফিসার ক্যাপ্টেন কিংসলেকে ঘিরে ফেলে রেড ইন্ডিয়ানরা। একটাই উপায় ছিল বাঁচার, তা হলো ঘোড়া নিয়ে পশ্চিম তীরের দিকে যাওয়া। কিন্তু হ্রদ পেরোবার সময় ঘোড়াটার মৃত্যু হয় প্রচণ্ড ক্লান্তিতে। আর হ্রদটির নাম হয়ে যায় কিংসলের নামে।

বৈমানিকদের কাছে সুন্দর হ্রদটি এর পরিষ্কার পানির পাশাপাশি মাছ শিকার ও ওয়াটার স্কিইংয়ের জন্য বিখ্যাত। হ্রদের উত্তর ও পশ্চিম পাশে শ দুয়েক ডক বা ঘাট আছে। পূর্ব ও দক্ষিণ অংশে অবস্থান ক্যাম্প ব্ল্যাডিংয়ের। ফ্লোরিডা ন্যাশনাল গার্ডের সামরিক ইউনিটগুলো ও স্পেশাল ফোর্সের প্রশিক্ষণের জায়গা হলো এই ক্যাম্প ব্ল্যাডিং। কোনো কোনো সূত্রের দাবি, এটি ফ্লোরিডার সবচেয়ে পুরোনো ও উচ্চতম হ্রদ।

হ্রদের তলদেশ বালুময়। বৃষ্টির পানি ও তলদেশ চুঁইয়ে আসা পানি এর প্রধান উৎস। ফ্লোরিডার গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উষ্ণ মাসগুলোতেও হ্রদটির পানি বেশ শীতল থাকে। এর কারণ হ্রদটির তীরের আশপাশের মাটির তলার ঝরনাগুলো।

কচুরিপানাসহ ক্ষতিকর জলজ প্রায় সব উদ্ভিদ থেকেই মোটামুটি মুক্ত বলতে পারেন হ্রদটিকে। ঝড়ের সময় পানির সঙ্গে চলে আসা কিছু ময়লা এবং আশপাশের অনুন্নত কোনো সেপটিক ট্যাংক কখনো কখনো এর পানির জন্য কিছুটা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

লেকটিতে পর্যটকদের জন্য আছে নানা ধরনের বিনোদনের ব্যবস্থা। সব মিলিয়ে এটি ক্যাম্পিংয়ের আদর্শ জায়গা। এর ক্যাম্প গ্রাউন্ডে পাবেন কেবিন, পিকনিকের প্যাভিলিয়নসহ আরও অনেক কিছু। সব মিলিয়ে চমৎকার, গোলাকার হ্রদটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্য ভ্রমণে গেলে আপনার কিছুটা সময় দাবি করতেই পারে!

মরুর বুকে বিশাল চোখ

বিশাল সাহারা মরুর মাঝখানে ছড়িয়ে আছে প্রায় ৩০ মাইল ব্যাসের ভৌগোলিক এক বিস্ময়। রিচাট স্ট্রাকচার নামে পরিচিত জায়গাটির মাঝখান দিয়ে হেঁটে গেলে এটাকে তেমন আশ্চর্য কিছু বলে মনে না-ও হতে পারে আপনার। বিষয়টা মূলত ধরা পড়ে নভোচারীদের চোখে। ওপর থেকে তাদের কাছে একে মনে হয় বিশাল এক গোলাকার চোখের মতো।

রিচাট স্ট্রাকচারের অবস্থান সাহারা মরুভূমির মৌরতানিয়ার অংশে। দেশটির শহর ওয়াদেন থেকে খুব দূরে নয় এটি। আগের দিনের নভোচারীরা এটা দেখেই বুঝে যেতেন তারা সাহারা মরুভূমির ওপর আছেন। ওপর থেকে এমন গোলাকার একটা চোখ বা বুলস আইয়ের মতো দেখানোয় অনেকেই একে ডাকেন আই অব আফ্রিকা বা 'আফ্রিকার চোখ' বলে। কেউ আবার পরিচয় করিয়ে দেন 'সাহারার চোখ' হিসেবে।

এবার আশ্চর্য এই প্রাকৃতিক কাঠামোটির জন্ম কীভাবে তা জেনে নেওয়া যাক। একসময় ভাবা হতো এটি মৃত কোনো আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ বা বিশাল কোনো বস্তু যেমন উল্কা পতনের ফলে সৃষ্টি হওয়া বড় গর্ত। তবে এখন বিশ্বাস করা হয়, ভৌগোলিক কোনো ডোম বা গম্বুজ আকারের প্রাকৃতিক এক বিশাল পাথরখণ্ডের ক্ষয়ের ফলেই এর সৃষ্টি। আর ভূত্বকের নিচের গলিত উত্তপ্ত তরল খনিজের চাপে এই ক্ষয় হয়েছে।

আরেকটু সহজভাবে বললে, এ সময় মরুর সমতলে ফোসকার মতো পড়ে। এদিকে বিশাল পাথরের স্তরগুলোয় ফাটল ধরে। পরে ধীরে ধীরে এগুলো ভেঙে ও ক্ষয় হতে হতে একপর্যায়ে মোটামুটি সমতল হয়। কিন্তু এর মধ্যে একের পর এক রিং বা আংটির অবয়ব ফুটে ওঠে। পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে কত সময় লেগেছে শুনে চোখ কপালে উঠবে আপনার, আনুমানিক ১০ কোটি বছর।

একসময় ভাবা হতো এটি মৃত কোনো আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ বা বিশাল কোনো বস্তু যেমন উল্কা পতনের ফলে সৃষ্টি হওয়া বড় গর্ত। সাহারার চোখ মরুর দুর্গম এলাকায় অবস্থিত। তাই খুব বেশি মানুষের আনাগোনা এখানে ছিল না। এটাই স্বাভাবিক। তারপরও এই পথে যাতায়াত করা মানুষের কেউ কেউ এখানকার ভূপ্রকৃতিতে কিছুটা অস্বাভাবিকতা আবিষ্কার করেননি যে তা নয়। তবে এটা যে এতটা আশ্চর্যজনক এক জিনিস তা কল্পনাও করতে পারেননি। তারপরই নভোচারীরা ওপর থেকে এর অদ্ভুত চেহারা আবিষ্কার করেন এবং বিষয়টি অন্যদের নজরে আনেন। ব্যস, এটি গোটা পৃথিবীতেই আশ্চর্য এক ভৌগোলিক বৈচিত্র্য হিসেবে পরিচিতি পেয়ে গেল।

এখন নিশ্চয় এর নাম রিচাট স্ট্রাকচার হলো কীভাবে তা জানতে চান। স্থানীয় ভাষায় নিচাট অর্থ 'পালক'। আরবিতে আবার এটি পরিচিত তাগেনস নামে। স্থানীয় কুয়া থেকে পানি আনার জন্য যে চামড়ার থলে ব্যবহার করা হয়, সেটির গোলাকার মুখকে বোঝানো হয় শব্দটি দিয়ে। বুঝতেই পারছেন, এর গোলাকার আকৃতিই একে এমন নাম পাইয়ে দিয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই নভোচারীদের মাধ্যমে রিচাট স্ট্রাকচারের আশ্চর্য চেহারার পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ার পর একে নিয়ে মাতামাতি শুরু হয়। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব জিওলজিকেল সায়েন্স (আইইউজিএস) ১০০ ভৌগোলিক হেরিটেজ এলাকার যে তালিকা করে, তার একটি নির্বাচিত হয় এটি। তবে আরও অনেক ভৌগোলিক বিস্ময়ের মতোই কাছ থেকে নয় বরং দূর থেকেই একে বেশি দৃষ্টিনন্দন দেখায়।

নভোচারীরা মহাশূন্য থেকে 'সাহারার চোখে'র দিকে তাকিয়ে থাকতে পছন্দ করেন। তাদের চোখে এটি ধরা দেয় বিশাল কোনো গুলগুলে চোখ কিংবা অজ্ঞাত ভিনগ্রহবাসীর উড়ন্ত চাকি বা ফ্লাইং সসার অবতরণের জায়গা হিসেবে।

ওয়াদেন শহর থেকে জায়গাটির দূরত্ব ৩০ কিলোমিটার।

এই লেখাটা পড়ার পর আপনার যদি সেখানে যেতে ইচ্ছা করে, তবে পথটা বাতলে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। এ জন্য প্রথমেই আপনাকে যেতে হবে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মৌরতানিয়ায়। রাজধানী শহর নোয়াকচট থেকে চলে যাবেন ওয়াদেন শহরে। সেখান থেকে 'সাহারার চোখে'র দূরত্ব বেশি নয়, মোটে ৩০ কিলোমিটার। তবে মনে রাখবেন, বালুর রাজ্যে পথ চিনতে অবশ্যই একজন স্থানীয় গাইডের সহযোগিতা লাগবে। সেখানে পৌঁছালেও স্বাভাবিকভাবেই কাছ থেকে জায়গাটির আসল সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন না। তবে সঙ্গে ড্রোন থাকলে যে ভালো কিছু ছবি তোলা ও ভিডিও ধারণা করা সম্ভব হবে তাতে সন্দেহ নেই।